

নাম: মো: নাজমুল ইসলাম

জন্ম তারিখ: ১৩ নভেম্বর, ১৯৯৮

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ব্যবসা,

শাহাদাতের স্থান : ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পিজি হাসপাতালে

শহীদের জীবনী

নাজমুল ইসলাম ১৩ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে সিলেট জেলার লাক্ষনাবন্দ ইউনিয়নের নিশ্চিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তৈয়ব আলী ও মাতা চায়না বেগম। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬। শহীদ নাজমুল ইসলাম এর পিতা একজন কৃষক ছিলেন। তাদের অল্প কিছু কৃষি জমি আছে সেখানে বৃদ্ধ বাবা ধান আবাদ করে ছয় মাসের সংসার চালাতেন। অভাবের সংসার হওয়ার কারণে নাজমুল তেমন পড়াশোনার সুযোগ পান নাই। বৃদ্ধ বাবার সংসারের হাল নাজমুলের ওপর বর্তায়। তিনি ১১ বছর ধরে অন্যের দোকানে কাজ করতেন। নাজমুল কাপড় ও জুতার দোকানের আয় দিয়ে মূলত তাদের সংসার চালাত। জুতার দোকানের মালিক তার উপর সম্ভ্রষ্ট হয়ে একটি দোকান করে দেন। নাজমুলের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ব্যবসা বড় করেন এবং আরো একটি কাপড়ের দোকান দেন। তিনি বিয়ে করেছেন মাত্র তিন মাস আগে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী খাদিজা বেগমের মানসিক সমস্যা হয়ে পাগলপ্রায় অবস্থা। বর্তমানে বাবার বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বড় ভাই তাইজুল ইসলাম আলিম মাদ্রাসা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এবং একমাস পূর্বে শ্রমিক ভিসায় রিযিক অন্বেষণের তাগিদে কানাডাতে পাড়ি জমান। ছোট ভাই সাইদুল ইসলাম বিএনকে হাই স্কুলে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছেন। বোন তানজিলা বেগম বিএনকে হাই স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছেন।

শিশু বাচ্চাকে বাঁচাতে যেভাবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন কেবল বাংলাদেশ নয় বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। ক্ষোভ ও হতাশা যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সুরাহা হয় না তখন বিপ্লব হয়ে ওঠে অপরিহার্য নিয়তি। অধিকার আদায়ে সচেতন শিক্ষিত ছাত্রসমাজ একসময় স্বৈরশাসন ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে থাকে এবং সর্বশেষ মহা বিপ্লবের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে আনে। ১৮ সালের পরিপত্রে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ৬ ডিসেম্বর ২০২১ সালে হাইকোর্টের রিট করে সাত মুক্তিযুদ্ধের সন্তান ৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই পরিপত্রে বাতিলের রায় দেন। হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সূচনা হয়। সেদিনই বিশ্ববিদ্যালয় কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনই অনুষ্ঠিত ছাত্রসমাবেশের ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহ্বান জানানো হয়। একই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পরে ৩ জুলাই আন্দোলনকারীরা ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখে এবং আরো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিক্ষোভ ও অবরোধ করে। ৪ জুলাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল সিদ্ধান্তে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখেন আপিল বিভাগ এবং গুনানি না করে নট টুডে বলে আদেশ দেন। ৬ জুলাই সড়ক মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। নাম দেয়া হয় ‘বাংলা রুকেড’। সেদিন এই ঘোষণা করা হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের। ১৩ জুলাই সকল গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং জরুরী অধিবেশন ডেকে সরকারি চাকরির সকল যৌক্তিক সংস্কার দাবি করা হয়। পরের দিন রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় সংসদের জরুরী অধিবেশন ডাক দেয়ার সময় বেঁধে দেয়া হয়। সেদিন বিকালে স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে বলেন কোটা মুক্তিযুদ্ধের সন্তানেরা পাবে না তো পাবে রাজাকারের বাচ্চারা। সরকার প্রধানের এমন বক্তব্য যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো হলো। এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাতেই প্রতিবাদ করেন এবং স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা। “তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার সরকার” সেই বিক্ষোভ মিছিল থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন কর্মসূচি দেয়। বলেন, ১৫ জুলাই দুপুর ১২টায় রাজু ভাস্কর্যের সামনে সরকার প্রধানের এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। পরের দিন সকাল দশটায় পাল্টা সমাবেশ দেয় স্বৈরাচার সরকারের অন্যতম পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগ বিকাল তিনটায় সমাবেশ করবে একই স্থানে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজু ভাস্কর্যের দিকে আসতে থাকে ঢাকার সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু দুপুরের ঠিক কিছুক্ষণ পরেই বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যেতে না দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এই খবর যখন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কানে পৌঁছায় তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে তৈরি হয় ছাত্রলীগের সাথে সাধারণ ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ। এতে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয় প্রায় তিন শতাধিক সাধারণ শিক্ষার্থী। একটা পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংঘর্ষ থেমে গেলে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামীলীগের খুনি কন্নীরা মেডিকলে ভর্তি রক্ত আহত শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ধ্যার দিকে আবার হামলা চালায়। কি নেক্সারজনক ঘটনা! গা শিউরে ওঠে। হাসপাতাল হচ্ছে চিকিৎসা নেয়ার প্রতিষ্ঠান এখানে সকল কিছুই নিরাপদ কিন্তু খুনি সরকারের পেটোয়া বাহিনী নিরাপদ স্থানে অরাজকতা সৃষ্টি করে জনজীবনে নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে অবতীর্ণ হয়। পরের দিন কলঙ্কিত ছাত্রলীগের এই হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সারাদেশে দিনভর ব্যাপক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষে নিরস্ত্র আবু সাঈদ সহ ছয় জন সাধারণ শিক্ষার্থী নিহত হয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের নীতি নির্ধারণ করা। ৬ জুলাই অতিরিক্ত বিজিবি মোতায়েন করা হয়। ১৭ জুলাই প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদদের স্মরণে

